Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual- Peer Reviewed-Bi-Annual
Digital Research Journal
Website : santiniketansahityapath.org.in
ISSN 2583-6706 (Online)
Volume-2 Issue-2 January 2024

মারণাস্ত্রের অভিনবত্বে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশ বক্সী

শিল্পা বিশ্বাস

Link : https://bit.ly/3HucwTz

সারসংক্ষেপ : 'অস্ত্র' — যা ছিল একদিন শুধুমাত্র আত্মরক্ষার উপকরণ মাত্র, সময় তার পরিস্থিতি অনুযায়ী তার সংজ্ঞাকে পরিবর্তিত করে দেয়। সে আর আত্মরক্ষার উপকরণ মাত্র নয়, তার কর্ম এখন বৃহৎ। মানুষের ষড়রিপুর কোনো একটিও যদি প্রবল হয়ে ওঠে, তাহলে এই 'অস্ত্র' অনেক ক্ষেত্রেই তার সহায় হয়ে ওঠে। পৃথিবীতে হত্যাযজ্ঞের ইতিহাস নির্মাণ করতে গিয়ে আবিষ্কৃত হয়েছে নানাধরণের 'অস্ত্র'। অস্ত্রের সঙ্গে অপরাধ ও অপরাধীর সম্পর্কটা আবার নিবিড়। আর এই তিনটি বিষয় যেখানে মিলে যায়, সেখানে দেখা মেলে এমন এক চরিত্রের যিনি সন্ধান করেন সত্যের। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এমনই এক সত্যান্বেষী ব্যক্তিত্ব ব্যোমকেশ বক্সী। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্ট এই চরিত্রটিকে কেন্দ্র করে স্রষ্টা নিজেই নিজের অস্ত্র নির্বাচনের ভাবনায় যে অভিনবত্ব দেখিয়েছেন, তার অনুসন্ধানই আজকের এই গবেষণা প্রবন্ধ 'মারণাস্ত্রের অভিনবত্বে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশ বক্সী' শীর্ষক গবেষণাপত্রের উপজীব্য।

সূচক শব্দ : অস্ত্র, অপরাধ, অপরাধী, গোয়েন্দা, মারণাস্ত্র, সত্যান্বেষী

'মা'রণাস্ত্র' শব্দটি শুনলে আমরা আজও যতটা বিচলিত হই, ততটা বিচলিত আমাদের না হলেও চলে। আসলে, 'মারণাস্ত্র' শব্দটার মতো, জিনিসটাও বহু প্রাচীন, একেবারে যাকে বলে সেই প্রস্তর যুগের জিনিস। মানুষ আত্মরক্ষার তাগিদে সেকালেই এগুলো বানিয়েছিল। তাই, বোঝাই যাচ্ছে বয়সের বিচারে এই 'মারণাস্ত্র' জিনিসটার কাছে আমরা মানে এই যারা বিজ্ঞানের ভাষায় 'হোমোসেপিয়ানস্' তারা নেহাতই শিশু। তবে আমরা নিজেদের স্বার্থেই এই বয়োবৃদ্ধ প্রপিতামহের আদল এমন বদলে দিয়েছি যে তার প্রাচীনত্ব আজ আর ধরা পড়ে না। সময়ের সঙ্গে তার প্রয়োগও গেছে বদলে। আদিম হাতিয়ার আজ আণবিক হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। একদিন মানুষ হাতিয়ার বানিয়েছিল আত্মরক্ষায় আজ কেবল আত্মরক্ষায় নয় স্বার্থরক্ষাতেও হাতিয়ার বানায়। আজ যার অস্ত্র যত অভিনব, সে তত বলিয়ান। আজ আমাদের আগ্নেয় অস্ত্র, ধাতব অস্ত্র, রাসায়নিক অস্ত্র, আণবিক অস্ত্র — নামগুলো শুনলে বিভ্রম হয়, মনে হয় এরা একে অন্যের থেকে কত আলাদা। বিষয়গত দিক থেকে এরা ততটা আলাদা নয়। হ্যাঁ, এরা আলাদা কিন্তু সে কেবল অবয়বে, এরা আদতে এক, কারণ এরা প্রত্যেকেই মারণাস্ত্র।

মারণাস্ত্র শব্দটার গা থেকে একটা অপরাধ শব্দের গন্ধ পাওয়া যায়। এই অপরাধ বা ক্রাইম কিংবা অপরাধী বা ক্রিমিনাল এই শব্দগুলোর ব্যবহার কবে থেকে শুরু হয়, সেটা দিনক্ষণ মেপে বলা সম্ভব নয়। তবে, এই শব্দগুলোর সঙ্গে যাদের সম্পর্ক সবচেয়ে বেশি তারা হয় পুলিশ নয় গোয়েন্দা। যদিও, সাহিত্যের পাতায় এই শব্দগুলো দেখলে আমাদের গোয়েন্দার কথাই সবার আগে মনে পড়ে। এই গোয়েন্দা কাহিনির সৃষ্টির আদি ইতিহাসটাও ধোঁয়াটে। ভারতবর্ষে বৈদিক সাহিত্যে বা খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী থেকে এই গোয়েন্দা কাহিনির আভাস পাওয়া যায়। যদিও, পৃথিবীর প্রাচীনতম গোয়েন্দা কাহিনির উল্লেখ রয়েছে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীতে রচিত বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের দানিয়েলের গল্পে। তবে, আধুনিক গোয়েন্দা কাহিনির সূচনা হয় উনবিংশ শতাব্দীতে। গোয়েন্দা কাহিনি সৃষ্টির ইতিহাস যেমনই হোক না কেন, উনবিংশ শতাব্দী থেকে আজকের দিন পর্যন্ত তার বিবর্তন ঘটে চলেছে অনবরত। এই বিবর্তনের ইতিহাসের দিকে চোখ রাখলে আমরা দেখব সময়কাল অনুযায়ী কাহিনির গঠনশৈলী বদলেছে তা নয়। সময়কাল অনুযায়ী বদলেছে অপরাধের ধরণ, গোয়েন্দার অপরাধ নির্ণয়ের পদ্ধতি, অপরাধীর মানসিকতা, অপরাধীর অপরাধ সংঘটনের উপকরণ।

১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ৭ আষাঢ় (১৯৩২ সালের জুন মাস) থেকে ১৩৬৩ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন-চৈত্র (১৯৭০ সালের মার্চ মাস), এই দীর্ঘ আটত্রিশ বছর ধরে অপরাধ জগতের একটা প্রতিলিপি এঁকেছেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গোয়েন্দা কাহিনিতে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাত্র সাত বছর আগে সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সীর সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় হয়। এই পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতায় যখন ছেদ পড়ে তখন পরাধীন ভারতবর্ষও তার স্বাধীনতার বাইশ বছর উদ্‌যাপন করার দোরগোড়ায়। কিন্তু এপার বাংলা ওপার বাংলা তখনো রক্তাক্ত, বিধ্বস্ত — একদিকে নকশাল আন্দোলনে আর দিকে স্বাধীনতার ক্ষিদেয়। যেখানে একটা সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিপর্যস্ত পরিস্থিতি জন্ম দেয় একাধিক অপরাধের। সেখানে একটা বিশ্বযুদ্ধ, দুটো দেশের দুটো ভিন্ন সময়ে দুটো মরণপণ স্বাধীনতা সংগ্রাম আর একটা রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের সূচনা হচ্ছিল এই আটত্রিশ বছরের মাথায়। অর্থাৎ এই দীর্ঘ সময় ধরে জন্ম হচ্ছিল অসংখ্য অপরাধের। রাতারাতি বদল আসছিল ভারতবর্ষের বাজার অর্থনীতিতে, পাল্লা দিয়ে বদলে যেতে শুরু করেছিল মানুষের চিন্তা-চেতনা থেকে জীবন-যাপনের স্টাইল। স্বাভাবিকভাবে সময়কালের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বদল আসছিল অপরাধের কারণ থেকে অপরাধের ধরণে। স্বভাবতই শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশ কাহিনি অপরাধ-সংক্রান্ত বৈচিত্র্যে, বাংলা সাহিত্যে বিরল।

বৈচিত্র্যময় সময়কালের কারণে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোয়েন্দা কাহিনি বা ব্যোমকেশ কাহিনির বিশেষত্বই হয়ে উঠেছে তার মারণাস্ত্র। 'সত্যান্বেষী'তে ব্যোমকেশের প্রথমে আগমন ঘটলেও রচনাকালের দিক থেকে এগিয়ে থাকে 'পথের কাঁটা'। মারণাস্ত্র অভিনবত্বও শুরু হয়েছিল এই 'পথের কাঁটা' থেকেই। বর্তমানে আমরা যত ধরণের মারণাস্ত্র সম্পর্কে ওয়াকিবহাল তার প্রত্যেকটির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় ব্যোমকেশ বক্সীর সত্যান্বেষণের মাধ্যমে। নিম্নে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোয়েন্দা কাহিনিতে ব্যবহৃত মারণাস্ত্রের একটি তালিকা দেওয়া হলো —

	গল্পে ব্যবহৃত মারণাস্ত্র	মারণাস্ত্রের ধরন
সত্যান্বেষী	১। মর্ফিয়ার গুঁড়ো ২। ছুরি	১। রাসায়নিক ২। ধাতব
পথের কাঁটা	গ্রামোফোনের পিন	ধাতব
মাকড়সার রস	১। মাকড়সার রস (মারণাস্ত্র বলা চলে না, আত্মহনন অস্ত্র বলা যেতে পারে) ২। পেনের নিব	১। রাসায়নিক ২। ধাতব
অর্থমনর্থম	সুঁচ	ধাতব
চোরাবালি	চোরাবালির ফাঁদ	প্রাকৃতিক
অগ্নিবাণ	বিষাক্ত দেশলাই কাঠি	রাসায়নিক
উপসংহার	বিষাক্ত দেশলাই কাঠি	রাসায়নিক
রক্তমুখী নীলা	ছুরি	ধাতব
ব্যোমকেশ ও বরদা	গলা টিপে খুন	শারীরিক শক্তি প্রয়োগ
চিত্রচোর	বন্দুক (আত্মহত্যা)	আগ্নেয় অস্ত্র
দুর্গরহস্য	১। সাপের বিষ ২। ফাউন্টেন পেনের নিব	১। রাসায়নিক ২। ধাতব
চিড়িয়াখানা	১। নিকোটিন ২। হাই ব্লাড প্রেশারের রোগীকে কড়ি কাঠ থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া ৩। পটাশিয়াম সাইনাইডের অ্যাম্পুল (আত্মহত্যায় ব্যবহৃত)	১। রাসায়নিক ২। শারীরিক অবস্থাকে কাজে লাগানো ৩। রাসায়নিক
আদিম রিপু	গুলি করে হত্যা	আগ্নেয় অস্ত্র
বহ্নি-পতঙ্গ	১। কিউরারি প্রয়োগ ২। গুলি করে হত্যা	১। রাসায়নিক অস্ত্র ২। আগ্নেয় অস্ত্র
রক্তের দাগ	গুলি করে হত্যা	আগ্নেয় অস্ত্র
অমৃতের মৃত্যু	১। বুবি ট্রাপ ২। গুলি করে হত্যা	১। আগ্নেয় অস্ত্র ২। আগ্নেয় অস্ত্র

গল্পের নাম	গল্পে ব্যবহৃত মারণাস্ত্র	মারণাস্ত্রের ধরন
শৈলরহস্য	খাদ থেকে ধাক্কা দিয়ে খুন	প্রাকৃতিক উপায় অবলম্বন
অচিন পাখি	Thyroid cartilage ভেঙে খুন	শারীরিক শক্তি প্রয়োগ
কহেন কবি কালিদাস	মোটর গাড়ির স্প্যানার	ধাতব অস্ত্র
অদৃশ্য ত্রিকোণ	১। গলা টিপে খুন ২। গুলি করে খুন ৩। ছুরি দিয়ে খুন	১। শারীরিক শক্তি প্রয়োগ ২। আগ্নেয় অস্ত্র ৩। ধাতব অস্ত্র
অদ্বিতীয়	খুনের অস্ত্র ছুরি	ধাতব অস্ত্র
মগ্নমৈনাক	ছাদ থেকে ধাক্কা দিয়ে খুন	শারীরিক শক্তি প্রয়োগ
দুষ্টচক্র	১। ছুরি ২। প্রোকেন	১। ধাতব অস্ত্র ২। রাসায়নিক
হেঁয়ালির ছন্দ	গুলি করে খুন	আগ্নেয় অস্ত্র
রুম নম্বর দুই	১। গলা টিপে খুন ২। সার্জিক্যাল কাঁচি দিয়ে খুন	১। শারীরিক শক্তি প্রয়োগ ২। ধাতব অস্ত্র
ছলনার ছন্দ	গুলি করে খুনের চেষ্টা	আগ্নেয় অস্ত্র
শজারুর কাঁটা	শজারুর কাঁটা	প্রাকৃতিক অস্ত্র
বেণীসংহার	দাড়ি কাটার ক্ষুর	ধাতব অস্ত্র
লোহার বিস্কুট	গুলি করে খুন	আগ্নেয় অস্ত্র

উপরিউক্ত তালিকাতে চোখ বোলালেই বোঝা যায় শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোয়েন্দা কাহিনিতে মারণাস্ত্রের অভিনবত্ব ঠিক কি রকম। আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ব্যবহৃত সামান্য জিনিসই বুদ্ধি আর প্রয়োগের প্রভাবে মানুষ খুনের হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। সামান্য ফেলে দেওয়া গ্রামোফোনের পিন থেকে দাড়ি কাটার ক্ষুর, ফাউন্টেন পিনের নিব, গাড়ির স্প্যানার যে মারণাস্ত্র হয়ে উঠতে পারে তার প্রমাণ রয়েছে 'পথের কাঁটা', 'কহেন কবি কালিদাস', 'দুর্গরহস্য', 'বেণিসংহার'এর মতো গল্পে। মোট আটত্রিশটা গল্পের মধ্যে উনত্রিশটি গল্পেই বিভিন্ন ধরণের মারণাস্ত্রের প্রয়োগ করা হয়েছে। সর্বদা যে হত্যার ঘটনার ঘটেছে এমন নয়। কেউ কেউ বিভিন্ন ধরণের মারণাস্ত্র নিজের উপর প্রয়োগ করেই আত্মহননের পথ বেছেছেন। এক্ষেত্রে মারণাস্ত্র সম্পর্কে একটি কথা বলে নেওয়া জরুরি। উপরিউক্ত তালিকাটিতে শারীরিক শক্তি প্রয়োগ করে খুন কিংবা প্রাকৃতিক জিনিসকে মারণাস্ত্রের টাইপ বা ধরণের অন্তর্গত করা হয়েছে। কারণ — যে উপকরণের সঙ্গে হত্যার সম্পর্ক আছে তাকেই মারণাস্ত্র হিসাবেই এখানে নির্বাচন করা হয়েছে।

ব্যোমকেশ সিরিজের মারণাস্ত্র :

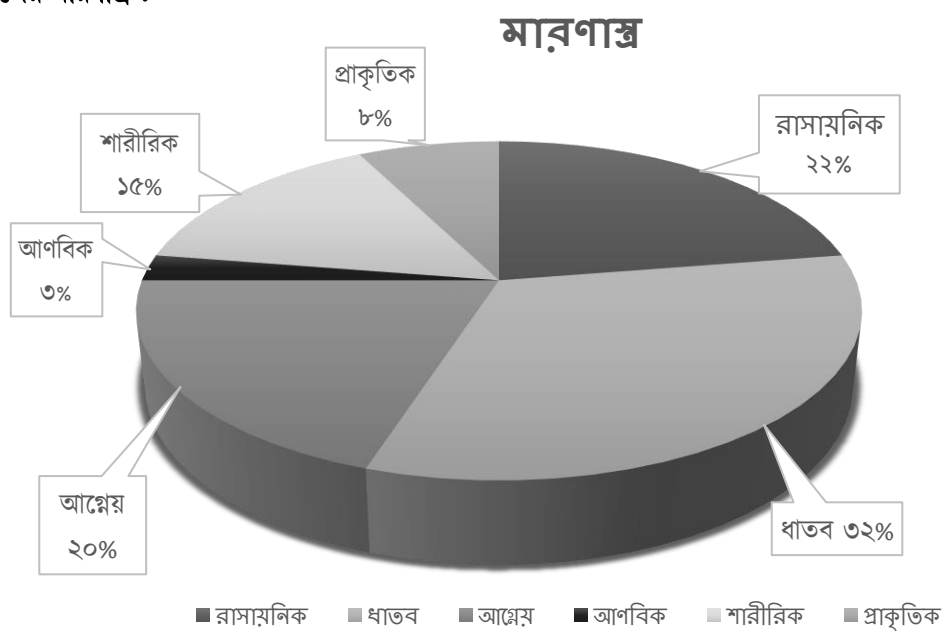

শারীরিক শক্তি কীভাবে মারণাস্ত্র হয়ে উঠেছে, তার প্রমাণ আছে 'ব্যোমকেশ ও বরদা', 'রুম নম্বর দুই', অদৃশ্য ত্রিকোণ'এর মতো গল্পে। সেখানে গলা টিপে খুন বা খুনের প্রসঙ্গ আছে। 'অচিন পাখি' গল্পে কেবলমাত্র হাতের পাঁজা দিয়ে Thyroid cartilage ভেঙে দু'বার খুন করা হয়েছিল। আবার, 'চিড়িয়াখানা' গল্পে নিশানাথবাবু ব্লাড প্রেশারের রোগী ছিলেন বলেই ভুজঙ্গাধরের পক্ষে তাঁর মৃত্যুকে স্বাভাবিক মৃত্যুতে পরিণত করা সম্ভব হয়েছিল। নিশানাথবাবু ব্লাড প্রেশারের রোগী না হলে ডাক্তার ভুজঙ্গাধরকে খুনের অন্য পন্থা অবলম্বন করতে হতো। তবুও স্বাভাবিক মৃত্যু প্রমাণ করা সমস্যাজনক ছিল। অর্থাৎ, কোথাও শারীরিক শক্তি আবার কোথাও সামান্য শারীরিক সমস্যা অপরাধীর হাতের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে।

'চোরাবালি' গল্পে চোরাবালির মতো প্রাকৃতিক উপকরণকে জমিদারের দেওয়ান কালীগতি ভট্টাচার্য খুনের হাতিয়ার বা মারণাস্ত্র করে তুলেছে। এখানেই প্রকৃতি মারণাস্ত্র হয়ে উঠছে। 'শজারুর কাঁটা' গল্পেও প্রবাল গুপ্ত একটি জীবের স্বাভাবিক দৈহিক উপকরণকে মারণাস্ত্র করে তুলেছে। তবে, সেকালে বন্য সংরক্ষণ আইন আজকের মতো কঠোর ছিল না বলেই প্রবাল গুপ্ত এত সহজে শজারুর কাঁটা সংগ্রহ করতে পেরেছিল আর শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় 'শজারুর কাঁটা' নামেই উপন্যাসের কাহিনি নির্মাণ করতে পেরেছিলেন। 'শৈলরহস্য' গল্পেও বিজয় বিশ্বাস-হৈমবতী বিশ্বাসের কাছে রক্তপাত ছাড়া খুন করা সহজ হয়ে গিয়েছিল কেবলমাত্র পাহাড়ের খাদের কারণে। এক্ষেত্রেও প্রাকৃতিক উপাদান বা প্রকৃতি নিজেই কীভাবে নিজের অজান্তেই হত্যাকারীর হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই এই শারীরিক এবং প্রাকৃতিক উপায় অবলম্বন করে ঘটানো খুন ব্যোমকেশ বক্সীর মাথা ব্যথার বিশেষ কারণ হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে 'চোরাবালি', 'চিড়িয়াখানা', 'শৈলরহস্য', 'শজারুর কাঁটা'র নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতেই হয়।

মোট আটত্রিশটা গল্পের মধ্যে একটি গল্পেই দূরসঞ্চারী মারণাস্ত্র প্রয়োগের প্রসঙ্গ আছে। 'অমৃতের মৃত্যু' গল্পে অস্ত্রের চোরাকারবারি বিশ্বনাথ মল্লিক সদানন্দ সুরকে ব্ল্যাকমেল করার অপরাধে বোমার সাহায্যে খুন করে। কিন্তু সে সদানন্দ সুরের বাড়িতে বোমা দিয়ে এমন এক ফাঁদ রচনা করেছিল যা মিলিটারি ভাষায় 'বুবি ট্রাপ' নামে পরিচিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কয়েক বছর পর বিশ্বনাথ মল্লিকের মতো মানুষের হাতে দূরসঞ্চারী অস্ত্র প্রমাণ করে, মারণাস্ত্রের সহজলভ্যতাকে।

আগ্নেয় অস্ত্র বলতে মূলত সাধারণ মানুষ স্বাভাবিক বন্দুক, পিস্তল ইত্যাদিকেই বোঝে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় আগ্নেয় মারণাস্ত্র হিসাবে সেই সাধারণ পরিচিত অস্ত্রগুলিরই প্রয়োগ দেখিয়েছেন। একমাত্র আগ্নেয় মারণাস্ত্র যেখানে অভিনবত্ব বিশেষ নেই। তবে, অনেক গল্পের ক্ষেত্রেই গল্পের প্রেক্ষাপটের সময়কালের সঙ্গে আগ্নেয় অস্ত্র প্রয়োগের একটা বিশেষ গভীর সম্পর্ক আছে। যেমন 'অমৃতের মৃত্যু' গল্পটির প্রসঙ্গেই আসা যাক। এই গল্পের প্রায় শুরুতে অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় বাঘমারি ও সান্তালগোলা জায়গা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলছেন,

"যুদ্ধের সময় একদল মার্কিন সৈন্য সান্তালগোলা ও বাঘমারি মধ্যস্থিত জঙ্গালের মধ্যে কিছুকাল ছিল; ... তারপর যুদ্ধের শেষে তাহারা স্বদেশে ফিরিয়া গেল, রাখিয়া গেল কিছু অবৈধ সন্তানসন্ততি এবং কিছু ক্ষুদ্রায়তন অস্ত্রশস্ত্র।"[১]

এই প্রসঙ্গ থেকেই বোঝা যায় কাহিনির সময়কাল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালের। 'অমৃতের মৃত্যু' গল্পের প্রকাশকাল ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ বা ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার চোদ্দ বছর পর। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রায় বারো বছর পর। ফলত স্বাধীন ভারত সরকারের প্রতিনিধি হয়েই অস্ত্রের চোরাকারবারিদের ধরতে ব্যোমকেশ বক্সীকে এই অঞ্চলে যেতে হয়েছিল। যুদ্ধের বাজারে ব্যবহৃত অস্ত্রগুলো, যা মার্কিন সেনাদের অবৈধ সন্তানের মতোই অবৈধ হয়ে গিয়েছিল, সেগুলোকেই বিশ্বনাথ মল্লিক অস্ত্রের চোরা বাজারে বিক্রি করে দিত। চালের কারবারের আড়ালেও এটিই ছিল সবচেয়ে বড় ব্যবসা। .৩৮ অটোম্যাটিক, অসংখ্য কার্তুজ আর চোদ্দটা হ্যান্ড গ্রিনেড তার ঘর থেকে পাওয়া খুব স্বাভাবিক। এ তো গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ১৪ বছর পরের ঘটনা। এবার একটু সময়কালে দিক থেকে পিছিয়ে যায় যাক। ১৯৫৫ সালে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আদিম রিপু' গল্পটি প্রকাশিত হচ্ছে। এই গল্পের সূচনায় আছে,

"দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে বাংলা দেশে, বিশেষত কলিকাতা শহরে, মানুষের জীবনের মূল্য খুবই কমিয়া গিয়াছে। পঞ্চাশের মন্বন্তরে আমরা জীবনমৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করিয়া ফেলিয়াছিলাম। তারপর জিন্না সাহেবের সম্মুখ সমর যখন আরম্ভ হইল, তখন আমরা মৃত্যুদেবতাকে একেবারে ভালোবাসিয়া ফেলিলাম।... সম্মুখ সমরের প্রথম অনলোদ্গার প্রশমিত হইয়াছে; কিন্তু তলে তলে অঙ্গার জ্বলিতেছে, এখানে ওখানে হঠাৎ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া আবার ভস্মের অন্তরালে লুকাইতেছে। কলিকাতার সাধারণ জীবনযাত্রার কিন্তু কোনও প্রভেদ দেখা যায় না। রাস্তায় ট্রাম-বাস তেমনি চলিতেছে, মানুষের কর্মতৎপরতার বিরাম নাই। দুই সম্প্রদায়ের সীমান্ত ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে হৈ হৈ দুমদাম শব্দ ওঠে, চকিতে দোকানপাট বন্ধ হইয়া যায়, রাস্তায় দুই চারিটা রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়িয়া থাকে। সুরাবর্দি সাহেবের পুলিস আসিয়া হিন্দুদের শাসন করে, মৃতদেহের সংখ্যা দুই চারিটা বাড়িয়া যায়। কোথা হইতে মোটর ভ্যান আসিয়া মৃতদেহগুলিকে কুড়াইয়া লইয়া অন্তর্ধান করে। তারপর আবার নগরীর জীবনযাত্রা পূর্ববৎ চলিতে থাকে।"[২]

অর্থাৎ, স্বাধীনতার আট বছর অতিক্রান্ত হলেও, পঞ্চাশের মন্বন্তর, মুক্তিযুদ্ধ, আর দেশ ভাগের ক্ষত তখনো দগদগে। কলকাতার আকাশে তখনো মাঝে মাঝে বোমারু বিমান দেখা যায়, আর হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিভেদ প্রায় রোজই শহরটার বুকে রক্তের দাগ এঁকে দেয়। এহেন পরিস্থিতির সুযোগে যে-কোনো রকমের অপরাধ যে সক্রিয়ভাবে মাথা চাড়া দেবে সেটাই খুব স্বাভাবিক। 'আদিম রিপু' কাহিনিতে কিংবা বাস্তবে বাঁটুলের মতো গুণ্ডা গোত্রীয় মানুষদের স্বাভাবিকভাবেই পেশা হয়ে উঠেছিল চোরাই অস্ত্র বিক্রি কিংবা ভাড়া দেওয়া। এই বাঁটুলের কাছ থেকেই প্রভাত রায়, অনাদি রায়কে হত্যা জন্য বন্দুক ভাড়া করেছিল। প্রভাত তার আদিম রিপুর দ্বারা আক্রান্ত হয়েই নিজের অজান্তেই নিজের বাবাকে খুন করে। এর সঙ্গে হয়তো তৎকালীন সামাজিক অবস্থার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। তবে পরোক্ষ যোগাযোগ তো অবশ্যই আছে। যদি তৎকালীন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতো, আগ্নেয় অস্ত্র যদি সামান্য টাকার বিনিময়ে ভাড়া করার পর্যায়ে না থাকত তাহলে, আপাতভাবে শান্ত, ভদ্র এই প্রভাত রায় খুন করার আগে ভাবত। এমনকি, হত্যার হাতিয়ার যোগাড় করতে হয়তো তাকে যা কসরৎ করতে হতো, সেটার জন্যই অনাদি রায়ের প্রাণটা বেঁচে যেতে পারত। সামাজিক অচলাবস্থাই প্রভাতের ক্রোধের আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়েছিল। সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সীকে 'সত্যান্বেষী' গল্প থেকেই আগ্নেয় অস্ত্র ব্যবহার করতে দেখা গেছে। তবে কাউকে নিজের হাতিয়ার দ্বারা আহত বা নিহত করতে কখনো দেখা যায় নি। 'রক্তের দাগ', 'বহ্নি-পতঙ্গ', 'হেঁয়ালির ছন্দ', 'ছলনার ছন্দ', 'লোহার বিস্কুট'এর মতো গল্পেও আগ্নেয় অস্ত্রের প্রয়োগ করতে দেখা গেছে হত্যাকারীকে। কিন্তু সময়কালের সঙ্গে আগ্নেয় মারণাস্ত্রের এমন দৃঢ় সম্পর্ক 'আদিম রিপু' আর 'অমৃতের মৃত্যু' গল্পেই দেখা গিয়েছিল।

ব্যোমকেশ সিরিজের মারণাস্ত্র প্রসঙ্গে সবচেয়ে অভিনবত্ব দেখা যায় ধাতব মারণাস্ত্র এবং রাসায়নিক মারণাস্ত্রের ক্ষেত্রে। ধাতব মারণাস্ত্রের প্রয়োগ দেখা গেছে মোট বারোটি কাহিনিতে। তার মধ্যে সাতটি কাহিনিতেই মারণাস্ত্রের অভিনবত্ব চোখে পড়ার মতো। রচনাকালের দিক থেকে প্রথম গল্প 'পথের কাঁটা'র মারণাস্ত্রটিই নিজের অভিনবত্বের কারণেই ব্যোমকেশ বক্সীকে কৌতূহলী করে তুলেছিল সত্যান্বেষণে। সামান্য গ্রামোফোনের পিনকে সাইকেলের ঘন্টির ভিতরে রেখে সাইকেলের ঘন্টিকেই ট্রিগারের মতো ব্যবহার করে, সকলের চোখের সামনে মানুষ খুন করার এমন পদ্ধতি এবং বুদ্ধি ব্যোমকেশ বক্সীর ক্ষুরধার বুদ্ধিকেও চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল। তাই কাহিনির শেষে সরকার বাহাদুরের থেকে আর্থিক পুরস্কারের চেয়ে ব্যোমকেশ বক্সী কাছে সাইকেলের ঘন্টিটা হয়ে উঠেছিল দামি,

"দু'হাজার টাকা পুরস্কারের বদলে সরকার বাহাদুর যদি আমাকে এই ঘন্টিটা বক্‌শিশ করেন, আমি মোটেই দুঃখিত হই না।"[৩]

'অর্থমনর্থম'এ করালীবাবু খুন হয়েছিলেন সেলাই করার সুঁচ দিয়ে। মেডালা আর ফার্স্ট ভার্টিব্রার মাঝখানে সুঁচ বিঁধিয়ে হত্যা করা হয়। একমাত্র মেডিক্যাল সায়েন্স সম্পর্কে যারা জ্ঞাত তারাই এইভাবে খুন করতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই সত্যবতীর দাদা সুকুমারের উপর সন্দেহ সবার আগে পড়ে। কারণ — সে মেডিক্যালের ছাত্র ছিল। কিন্তু, অনেক সময়েই আমরা যা সত্য বলে ভেবে নিই, তা সর্বদা সত্য না হতেও পারে। তাই, সঠিক সত্যান্বেষণ জরুরি। ধীরে ধীরে জানা যায় সুকুমার ডাক্তারির ছাত্র হলেও, প্রতিবন্ধী ফণিভূষণ সুকুমারের ডাক্তারি বই পড়ত। ফলত, সেও জানত মেডালা আর ফার্স্ট ভার্টিব্রার মাঝে সুঁচের মতো একটা ছোট ধাতব অস্ত্র বিঁধিয়ে দিলেই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সামান্য তুচ্ছ ঘরোয়া জিনিসটাও ফণিভূষণের হাতে পড়ে খুনের হাতিয়ারে পরিণত হয়ে গিয়েছিল নিমেষে।

'মাকড়সার রস'এর কাহিনিতে কোথাও খুন নেই। নন্দদুলালবাবু ফাউন্টেন পেনের নিবকে নিজের মাদক সেবনের পাত্র করে তুলেছিলেন। তবে এই ফাউন্টেন পেনের নিবই মারণাস্ত্র হয়ে উঠেছিল 'দূর্গরহস্য'এ মণিলালের হাতে। নন্দদুলালবাবু যেমন ফাউন্টেন পেনের কালির সঙ্গে মাকড়সার রস মিশিয়ে পেনে ভরে নিতেন, মণিলাল তেমনি কালির বদলে ভরে নিত সাপের বিষ। তারপর ধাতব পেনের নিবটাকে সুযোগ বুঝে ফুটিয়ে নিত পায়ের নীচের দিকের কোনো অংশে। পেনের নিব ধাতব হওয়ার কারণেই সহজেই গেঁথে যেত শরীরে। সাপের দাঁতের চিহ্ন করতে সে পাশাপাশি দু'বার নিবটি গেঁথে দিত। ফলত মৃত্যু অনিবার্য। যে কলম পকেটে বাহার দেয়, সেটাই মণিলালের হাতে পড়ে সাংঘাতিক মারণাস্ত্রে পরিণত হয়ে গিয়েছিল।

গাড়ির স্প্যানার নামক শক্ত ধাতব দণ্ডটিকেও যে প্রয়োজনে মারণাস্ত্র বানিয়ে তোলা যায়, যার সঙ্গে গাড়ির সম্পর্ক নেই তার কাছে পক্ষে এটা চিন্তা করা অস্বাভাবিক হলেও, একজন ট্যাক্সি ডাইভারের কাছে তাই অতীব স্বাভাবিক। 'কহেন কবি কালিদাস'এর ভুবনও এর ব্যতিক্রম ঘটায় নি। প্রাণহরি হালদার ভুবনের স্ত্রী মোহিনীকে দু'হাজার টাকায় অরবিন্দ হালদারের কাছে বিক্রি করেছে, একথা হঠাৎ জানতে পেরে ভুবনের মাথায় খুন ভর করে এবং রাগের বশেই সে তার হাতের কাছে থাকা ধাতব দণ্ডটি দিয়ে প্রাণহরিকে খুন করে দেয়। ভুবনের পেশাই ভুবনকে এই কাজের জিনিসটিকে মারণাস্ত্রে পরিণত করতে সাহায্য করেছে।

যে বাড়িতে পুরুষ থাকেন সে বাড়িতে দাড়ি কাটার ক্ষুর থাকাটা খুব স্বাভাবিক ঘটনা। 'বেণীসংহার' উপন্যাসে বেণীমাধব চক্রবর্তী আর তার দ্বাররক্ষী মেঘরাজ খুন হয়েছিলেন এই দাড়ি কাটার ক্ষুর দিয়েই। তাঁদের মৃত্যু পর খুনের অস্ত্র বেণীমাধববাবুর বাথরুমেই রাখা ছিল। সনৎ অতি সাবধানতা অবলম্বন করতে গিয়ে ক্ষুরটা ভালো করে না মুছলে ব্যোমকেশের খুনের হাতিয়ার নির্ণয় করতে সময় লাগত। প্রথমত, ব্যবহৃত ক্ষুরে মেঘরাজের হাতের ছাপ থাকাটা স্বাভাবিক, কারণ সেইই বেণীমাধববাবুর দাড়ি কামিয়ে দিত। অথচ ক্ষুরে তার হাতের ছাপ ছিল না। দ্বিতীয়ত, ব্যবহৃত ক্ষুর যে পরিমাণ ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল, সেটা হওয়াও স্বাভাবিক ঘটনা নয়। ব্যোমকেশের সন্দেহ এখান থেকেই দানা বাঁধে। ডাক্তারি পরীক্ষা ব্যোমকেশের সন্দেহে সিলমোহর দিয়ে দাড়ি কাঁটার ক্ষুরকে খুনের হাতিয়ার হিসাবে চিহ্নিত করে। তবে সনতের বর্যাতির পকেট থেকে বেণীমাধববাবুর রক্তের ফোঁটা না পাওয়া গেলে সনতকে খুনি প্রমাণ করা সম্ভব ছিল না। এই কাহিনিতে মারণাস্ত্র চয়নে অপরাধীর পছন্দ আর বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারা যায় না।

পেশায় গাইনোকোলজিস্ট শোভনা রায়, সার্জিক্যাল কাঁচি দিয়ে তার জামাই সুকান্ত সোম ওরফে রাজকুমার বসুকে খুন করেন। 'রুম নম্বর দুই' উপন্যাসে মিসেস শোভনা রায়ের পেশাগত অস্ত্রই খুনের অস্ত্র হয়ে ওঠে। আর ডাক্তার হিসাবে কোথায় কাঁচিটা বিঁধিয়ে দিলে মৃত্যু অনিবার্য তা তো তার জানাই ছিল। এছাড়া, 'সত্যান্বেষী', 'দুষ্টচক্র', 'অদ্বিতীয়', 'রক্তমুখী নীলা', 'অদৃশ্য ত্রিকোণ' এই পাঁচটি গল্পে ছুরি মারণাস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

"শুনেন নাই কি যে, রাজপুতের মেয়ে বিষ সঙ্গে না লইয়া এক পা চলে না?"[৪]

ঔরঙ্গজেবের উদ্দেশ্যে নির্ম্মলকুমারীর এই সংলাপ যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য তা ভারতবর্ষে রাজপুত জাতির ইতিহাস চর্চা করলেই সেটা বোঝা যায়। হত্যাকারী নারী হলে যে বিষ প্রয়োগের সম্ভাবনা বেশি থাকে একথা সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সীকে অনেকবারই বলতে শোনা গেছে। তবে, নারী জাতির সঙ্গে বিষ প্রয়োগের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গি হলেও বিষের উপর নারীর কেবল একক আধিপত্য তা নয়। নারী পুরুষ উভয়ের কাছেই ধুতুরা কিংবা আফিম মতো সাধারণ জিনিসের অধিক প্রয়োগের ফলাফল অজানা নয়।

শরদিন্দু অবশ্য বিষ বা বিষাক্ত ঔষধ এবং বিষাক্ত গ্যাস বা বিষাক্ত রাসায়নিক মারণাস্ত্র এই দুইয়ের ব্যবহার তাঁর গল্পে করেছেন। 'অগ্নিবাণ' ও 'উপসংহার' উপন্যাসে গ্যাস ও দাহক গোত্রীয় রাসায়নিক মারণাস্ত্রের সন্ধান শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় দিয়েছিলেন। 'অগ্নিবাণ'এ বিজ্ঞানী দেবকুমার সরকার তাঁর পরীক্ষাগারে এমন একটা বিষাক্ত দাহক আবিষ্কার করেন যা নাকে ঢুকলে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু অবধারিত। অথচ প্রমাণিত হবে হঠাৎ হার্ট ব্লক হয়ে মৃত্যু ঘটেছে। দেবকুমার সরকার এই বিষাক্ত জিনিস দেশালাইয়ের মশলার সঙ্গে মিশিয়ে এক বাক্স বিষাক্ত দেশলাই কাঠি বানান। এই পদ্ধতি অবলম্বন করে তিনি তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে মারতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নিয়তির চক্রান্তে তাঁর প্রথম পক্ষের প্রিয় দুই সন্তানই এই বিষাক্ত গ্যাসের কারণে মারা যায়। 'উপসংহার' গল্পে এই বিষাক্ত কাঠি ব্যোমকেশের পুরাতন শত্রু অনুকূলবাবু ব্যোমকেশের উপর প্রয়োগ করতে চেয়েছিল। ব্যোমকেশ সিরিজের প্রথম প্রকাশিত গল্প 'সত্যান্বেষী'তে অনুকুলবাবু ব্যোমকেশ ও অজিতকে মর্ফিয়ার গুঁড়ো ওষুধ হিসাবে দিয়েছিল, যাতে রাতে ব্যোমকেশকে খুন করতে সুবিধা হয়। মর্ফিয়া খুব মারাত্মক কোনো রাসায়নিক বিষ না হলেও এর অধিক প্রয়োগ মৃত্যুর কারণ হতেই পারে। মর্ফিয়ার মতোই একধরনের ড্রাগ প্রোকেন ব্যবহার করতে দেখা গিয়েছিল 'দুষ্টচক্র' গল্পে বিশু পালকে। ডাক্তার রক্ষিত প্রোকেন শিরদাঁড়ায় প্রবেশ করিয়ে বিশু পালের কোমর থেকে পা পর্যন্ত চার পাঁচ ঘণ্টা অসাড় করে রাখত। যদিও, ডাক্তারি শাস্ত্র অনুযায়ী প্রোকেন কোনো ওষুধ নয়, মাদক গোত্রীয় জিনিস, এই জিনিস দ্বারা এতক্ষণ একটি অঙ্গ অবশ হয়ে থাকাটা একটু অস্বাভাবিক লাগে। তাছাড়া কোনো মাদকই নির্দিষ্ট একটা অঙ্গে কাজ করতে পারে না। বরং Spinal anesthetic drug — Bupivacaine জাতীয় জিনিস প্রয়োগ করে ঘণ্টা দুই কোনো নির্দিষ্ট অঙ্গকে অসাড় বা প্যারালাইজড করে রাখার প্রক্রিয়া চালানো যেতে পারে।

নন্দদুলালবাবু নেশা করতেন মাকড়সার রস দিয়ে। আজও মাদকের বাজারে মাকড়সার রসের কদর বেশ জোরালো। যারা এই মাকড়সার রসে নেশা করেন তারা এতে অভ্যস্ত হলেও, কোনো অনভ্যস্ত মানুষকে এই রস সামান্য দিলেই তার মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। 'দুর্গরহস্য'এ ব্যবহৃত সাপের বিষ; বিষ হলেও কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত বিষ নয় বরং প্রাণীজ বিষ। তবে বিষাক্ত সাপের বিষের মতো অব্যর্থ মারণাস্ত্র আজকের অনেক রাসায়নিক বিষকেও হার মানায়। সাপের বিষ প্রয়োগে হত্যা অতি প্রাচীন একটি পদ্ধতি। মোঘল বাদশা ঔরঙ্গজেবের দরবারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীকে সাপের বিষ প্রয়োগেই অনেক সময় হত্যা করা হতো। 'চিড়িয়াখানা'য় ডাক্তার ভুজঙ্গাধর দু'রকমের রাসায়নিক বিষের ব্যবহার করেছিল। প্রথমটি নিকোটিন, তামাকজাত পদার্থ। সাধারণত নিকোটিন স্বাভাবিক মাত্রায় বিশেষ ক্ষতি করে না। কিন্তু নিকোটিন এমনিতে চোখ বা কানে সরাসরি প্রয়োগ করলে যে-কোনো প্রাণীর ক্ষতি হতে পারে। তাই পানুগোপালের কানে পুঁজের ক্ষত স্থানে নিকোটিন প্রয়োগের কারণে বিষক্রিয়ায় তার মৃত্যু হয়। দ্বিতীয়টি,

পটাশিয়াম সাইনাইড। ভুজঙ্গাধর তার আর বনলক্ষীর মৃত্যুকে নিশ্চিত করতে পটাশিয়াম সাইনাইডের অ্যাম্পুল চিবিয়েছিল। পটাশিয়াম সাইনাইড সকলের কাছে খুব পরিচিত বিষ। এর প্রয়োগে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটে। 'বহ্নি-পতঙ্গা' গল্পে ব্যবহৃত 'বহ্নি-পতঙ্গা' গল্পে ব্যবহার করা হয়েছিল কিউরারি। কিউরারি বাজারে নিষিদ্ধ বিষ এবং আদিম বিষ। মূলত দক্ষিণ আমেরিকার আদিম উপজাতির মানুষেরা তাদের তীরের ফলায় এই বিষ লাগিয়ে হত্যা করত। এই বিষ রক্তে মেশার খানিকক্ষণের মধ্যে শরীরের বিভিন্ন অংশে পক্ষাঘাত ঘটে এবং শ্বাসরোধ হয়ে মৃত্যু হয়। 'Tube Curare' নামক গাছ থেকে এই কিউরারি বিষ তৈরি হয়। এই ধরণের বিষই রতিকান্তের চক্রান্তে ডাক্তার পালিত নিজের অজান্তেই দীপনারায়ণের শরীরে ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে দিয়ে দেন, এবং দীপনারায়ণের মৃত্যু ঘটে। রাসায়নিক মারণাস্ত্রের প্রয়োগ ব্যোমকেশ সিরিজের এই ক'টি উপন্যাসেই দেখা গিয়েছিল।

বিষ প্রয়োগে হত্যা করার পদ্ধতি অতি প্রাচীন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও এই বিষ প্রয়োগের প্রসঙ্গ আছে এবং তিনি নিজেও শত্রুপক্ষকে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করার বিষয়টিকে সমর্থন করেছিলেন। আসলে, কাউকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে চাইলে বিষের থেকে অব্যর্থ ওষুধ আর কিই বা হতে পারে!

তথ্য সূত্র :

১। 'অমৃতের মৃত্যু', শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস; ২য় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০০৯, দ্বাত্রিংশ মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪২৩, পৃ. ২০৪
২। 'আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস', অশ্রুকুমার সিকদার, অরুণা প্রকাশনী, ৭ যুগলকিশোর দাস লেন, কলকাতা ৭০০০০৬, ৪র্থ সংস্করণ নভেম্বর ২০০৮, পৃ. ৩০
৩। ওই
৪। ওই
৫। ওই
৬। ওই, পৃ. ৩১
৭। ওই

লেখক পরিচিতি :

শিল্পা বিশ্বাস : বর্তমানে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষিকা।